মাসিক সোমবারে সঙ্কট

প্রথম সংখ্যা

প্রতিটি মুহূর্ত হোক আরেকটু রোমাঞ্চকর

সম্পাদকীয়

সাহিত্য মানবজীবনের এমন এক অংশ যা সচরাচর অগোচরে থাকে কিন্তু সেখান থেকেই এমন কলকাঠি নাড়ে যা অচিন্তনীয়। সে টানাটান উত্তেজনার রহস্য অভিযানই হোক বা সমাজের চিত্র ধারণ করা কোন উপন্যাস, আমাদের জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আর আশার বাণী সবসময়ই খুঁজে পাওয়া যায় তারই মধ্যে।রহস্য,অভিযান,গোয়েন্দা,কল্পবিজ্ঞানের মতো সাহিত্যের নানা শাখার ভিড়ে থ্রিলারকে সাহিত্য হিসেবে বোধহয় আমরা একটু কমই জানি। অবশ্য সিনেমায় থ্রিলার দেখে আমরা বরাবরই অভ্যস্ত। অ্যাকশন,সাইকোলজিক্যাল,স্পাইসহ আর কত ধরনের থ্রিলারের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটেছে সিনেমার কল্যাণে তার ইয়াত্তা নেই। কিন্তু সাহিত্যের দিক বিবেচনায় আমাদের উপমহাদেশে থ্রিলার এর প্রচলন অতোটা নাই।উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে ব্যোমকেশ বক্সী,ফেলুদা,কিরিটি, কাকাবাবুর মতো কালজয়ী অনেক গোয়েন্দা চরিত্রের আগমন ঘটলেও থ্রিলার কেন্দ্রিক চরিত্র সেরকম নেই।কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানার মতো চরিত্র থাকলেও তা অপ্রতুল। বর্তমানে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন সহ আরো অনেক লেখক বাংলা থ্রিলার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলছেন। এসবের পরেও বাংলায় রহস্য, গোয়েন্দা, শিশুতোষ বা কিশোর সাহিত্য নিয়ে নানা সাময়িকী বা ম্যাগাজিন থাকলেও থ্রিলার ম্যাগাজিন নেই বললেই চলে। পত্রিকা, ইন্টারনেট ঘেঁটে বাংলাদেশে শুধু একটি পরিচিত থ্রিলার ম্যাগাজিন "থ্রিলার জার্নাল" দেখা পেয়েছিলাম।সেই থেকে একটা ইচ্ছা ছিল বাংলা থ্রিলার সাহিত্যের প্রসারের জন্য কিছু একটা করা।ফল স্বরুপ সোমবারে সঙ্কটের অবতারণা।
নামটা নিয়ে বোধহয় অনেকেরই কৌতূহল থাকতে পারে। সোমবারে সঙ্কট! সোমবারেই শুধু সঙ্কট কেন? শনিবার বা রবিবার হলে দোষ কি ছিল? সোমবারে সঙ্কট নামটি ঠিক করার পিছনে একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা আছে। আশা করি পরবর্তী কোন সংখ্যায় তা বলা হবে এখন।
প্রথম সংখ্যায় থাকছে বাংলা ভাষায় থ্রিলার লেখায় জনপ্রিয় লেখক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনের থেকে অনুপ্রাণিত একটি ফিচার।আর থাকছে ধারাবাহিক ও নির্বাচিত গল্প সমূহ।
এ ম্যাগাজিনে যারা কাজ করেছে বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শুরু করতে যাওয়া তরুণ। সবশেষে আশা করি তাদের পরিশ্রম সার্থক হবে আর সোমবারে সঙ্কটের প্রথম সংখ্যা সবার ভালো লাগবে।

আলী রাইহান

সোমবারে সঙ্কট

সেপ্টেম্বর ২০২৪
২৩ সেপ্টেম্বর,২০২৪
৮ আশ্বিন,১৪৩১
বর্ষ ১ সংখ্যা ১

সম্পাদক
আলী রাইহান স্বপ্ন

সহ সম্পাদক
মৃন্ময় দাস

শিল্প নির্দেশনা ও সহযোগিতায়

শিহাব আহমেদ
সাইমুন সোহেল আবির
জেরিন রিশামণি জিম

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সোমবারে সঙ্কট টিম

ফটোগ্রাফার

ক্লিক! ক্লিক! শিহাব একটার পর একটা ছবি তুলে যাচ্ছে। চারদিকে কি হচ্ছে তার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই তার। তার ধ্যানজ্ঞান সবই বোধহয় ছবি তোলার প্রতি। আর আমি অস্বস্তি নিয়ে ওর সাথে দাঁড়িয়ে আছি।আশেপাশের লোকজন সব চোখ বড় করে আমাদের দেখছে।একে নিয়ে আমি আসলে যন্ত্রণায় পড়ে গেছি। সকালে ফোন দিয়ে বললো চল ঘুরে আসি। কেন যে রাজি হতে গেলাম। সকাল থেকে খালি পেটে বের হয়ে এখনো হেঁটেই চলেছি। ওর ঘুরতে যাওয়ার নমুনা হলো এদিক ওদিকে ছবি তুলে বেড়ানো। প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার হলে তাও মানতাম। ওরা তো প্রায়ই এরকম হুটহাট ছবি তোলে। কিন্তু এ ব্যাটা হলো প্রথমত শখের ফটোগ্রাফার তার উপর ছবি তুলছে নিজের **ANDROID** ফোন দিয়ে। আর ছবির বিষয়বস্তু তো আরো অবাক করার মতো।ঝড়ে একটা গাছ পড়ছে

কিংবা পুরনো একটা বাড়ি বা জংলা একটা বাড়ি।ওর সব ছবি তুলতে সাহায্য করতে হয় আমাকে।
ANGLE,DISTANCE, PORTRAIT,POSE এসব হাবিজাবি আমাকে বুঝায় আর ফোন সেভাবে ধরতে বলে। এসবের ছবি তুলে ও কি আনন্দ পায় এখনো বুঝে পাই না। ছবি তুলে নিজের ফেসবুক পেজে পোস্ট করে। সেখানে তার ছবি দেখার জন্য অবশ্য দর্শকের অভাব নে। ছবি দেখা দর্শকরাও বোধহয় আমার আর শিহাবের মতো বেকার। আমাদের যেমন বেকার হয়ে কোন কাজ নাই তেমনি ওদেরও ছবি দেখা ছাড়া কোন কাজ নেই।আজকে আমরা ছবি তুলতে এসেছি সোনাবাগ কলেজের এখানে। বড় একটা কলেজ। গাছগাছালিতে ভরপুর। কলেজের পিছনের দিকে একটু জংলা জায়গা। ওখানে পাকিস্তান আমলের কিছু ভাঙা, আগাছায় ছেয়ে যাওয়া দালান আছে। ওদিকে হাঁটতে হাঁটতে বটগাছের দিকে এসে দেখলাম ওখানে কিছু পাংকু টাইপের ছেলেমেয়ে আড্ডা দিচ্ছে। এদের এখানে আমার কেন জানি একটু অস্বস্তি লাগে কিন্তু শিহাব কোনোকিছুর তোয়াক্কা না করে সোজা বটগাছের পিছনের দিকে গেল। অগত্যা আমাকেও যেতে হলো। বটগাছের পিছনের দিকে দশ হাত এগোলে ভাঙা ধ্বসে যাওয়া দালানকোঠাগুলো দেখা যাচ্ছে। ছবি তুলতে তুলতে আমরা আরও ভিতরে চলে গেছি। ভিতরের দিকে একটা বড় দালান। এক তলা কিন্তু অনেকগুলো রুম। বাকি দালান গুলো থেকে একটু আলাদা এটা। কিছু কিছু জায়গায় শুধু ধ্বসে পড়েছে। বেশিরভাগ জানলাগুলো ভাঙা। বারান্দার গ্রিলে গাছের শিকড় জায়গা করে নিয়েছে। বৃষ্টির পানি পরতে পরতে অনেক জায়গায় শ্যাওলা পড়ছে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই ভবনে ঢোকার পথে যে দরজা ওটাতে একটা তালা।নতুন নয়,

মরিচা পরেছে।তাও একটু আশ্চর্যের বিষয়। যাইহোক শিহাব অনেক কয়েকটা ছবির পর আমি এখান থেকে বের হয়ে কিছু খেতে যেতে চাইলে ও আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাইলো।ওকে জোর করে টেনে এখান থেকে বের করলাম। গরম গরম চা আর সিঙ্গারা খেয়ে তারপর বাড়ি। আজকের জন্য ইতি। কিন্তু কালকে যে কি অপেক্ষা করতেছিলো এটা যদি আমি আগে জানতাম! পরদিন থেকে শুরু হলো বিপত্তির। দুপুরের দিকে আন্টির ফোন মানে শিহাবের মায়ের।আন্টি অনেকটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বললেন,আবীর,শিহাব কি তোমার ওখানে আছে?
না তো আন্টি।কেন ও বাসায় নাই?
না ও কাল রাত থেকে বাসায় আর ফেরেনি। ওতো প্রায়ই এরকম রাতে বাসার বাইরে থাকে কিন্তু সকাল সকাল তো চলে আসে কিন্তু বাবা ও আজ এখনো আসেনি। ওর সব বন্ধুকে ফোন দিয়ে শুনলাম ও ওদের কারো ওখানে নাই।
কিছু একটা করো বাবা। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।
বলে আন্টি ফোনে কান্না করতে শুরু করে দিলেন। কোনমতে আন্টিকে সামলিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। শিহাবের ফোন সুইচড অফ।দিনভর হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন সব জায়গায় ওকে খুঁজে ওর কোনো খোঁজ না পেয়ে অবশেষে পুলিশে খবর দিতে হলো। আমার মাথা পুরো এলোমেলো হতে শুরু করলো। ওকে কি কেউ অপহরণ করছে? কিন্তু না ও কোন ধনীর ঘরের দুলাল না ওর কাছে কোনো জমিজমা সম্পদ। তাহলে? কোথায় ও? কি হয়েছে ওর?কারো সাথে যোগাযোগ করতেছে না কেন? ওর গাধার মত আচরণের জন্য আধ ডজন গালি দিয়ে ওকে মেসেঞ্জারে মেসেজ দিলাম।১ ঘণ্টা হয়ে গেল তাও কোনো উত্তর দেয় নি।মেসেঞ্জারে ফোনও দিলাম তাও ধরে না।ব্যাপারটা কি! আরো ২ ঘণ্টা গেল তাও কোন যোগাযোগ নেই।পুলিশও কোন হদিস পায় নাই এখনো।এশার আযান দিল। নামাজ পরে এসে মনে একটা খটকা লাগলো।আচ্ছা ও কি নিজে পোস্টটা ডিলিট করেছে নাকি অন্য কেউ তাকে দিয়ে সেটা ডিলিট

করিয়েছে।সামান্য একটা ফেসবুক পোস্টে কার সমস্যা থাকতে পারে! আমার যতদূর মনে পড়ে গতকালকে ওর সোনাবাগ কলেজের কয়েকটা ছবি পোস্ট করার কথা। BACKUP হিসেবে ছবিগুলো GOOGLE DRIVE এ থাকার কথা। এটার পাসওয়ার্ড আমার কাছে ছিল। লগইন করে দেখলাম ছবিগুলো ওখান থেকেও সরানো হয়েছে। আজব ঘটনা।কি আছে ঐ ছবিগুলোতে যার জন্য এতকিছু হচ্ছে! ছবিগুলো একবার ভালো করে দেখা লাগতো কিন্তু সব তো ডিলিট হয়ে গেছে। দেখবো কেমন করে। হতাশ হয়ে বসে আছি তখনই মনে পড়লো ও কালকে আমাকে ঐ ছবিগুলো পাঠিয়েছিলো, দেখে দিতে যে এডিটিং সব ঠিকঠাক আছে কিনা। এত হুড়োহুড়িতে এটা মাথায় ছিল না। তাড়াতাড়ি WHATSAPP খুলে দেখলাম ছবিগুলো অক্ষত আছে। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। তাড়াতাড়ি করে ওগুলো ডাউনলোড করলাম। ডাউনলোড হওয়ার ২ মিনিট পরে দেখলাম ওখান থেকে ছবিগুলো ডিলিট করা হয়ে গেছে।

ছবিগুলো ভালো করে দেখতে থাকলাম।সবমিলিয়ে ৬টা ছবি। বিশেষ কিছু তো না। ভাঙা শ্যাওলা জমা এক তলা দালানের ছবি যেটা তুলেছিলাম আমরা।আমি আরো ভালো করে দেখতে থাকলাম।দুইটা ছবি কেন জানি চোখে লাগলো। একটা দালানে ঢোকার গ্রিলের দরজায় লাগানো তালার আর আরেকটা ফেটে দুভাগ হওয়া প্রাচীরের মধ্য দিয়ে দেখা যাওয়া ভাঙা কাঁচের জানালার। ভালো করে দেখার জন্য জুম করলাম। এবার যা দেখলাম তাতে ছবি ডিলিটের রহস্যটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। রাত ১০টা বাজে তখন।ছবি ডিলিট করার রহস্য ও শিহাবকে খুঁজে পাওয়ার ঠিকানা দুটো একই সুতোয় বাঁধা। এর সমাধানের জন্য যেতে হবে সেই সোনাবাগ কলেজের ভাঙা দালানটার ওখানে।সিদ্ধান্ত নিলাম এখনই বেড়িয়ে পড়বো ওখানে যাওয়ার জন্য।পুলিশকে এখনই কিছু জানানো যাবে না কারণ ওরা এটাকে হয়তো এতোটা গুরুত্ব দিবে না।তবে

একা গিয়ে বাহাদুরি দেখানোর ৩-৪ জন ভালো বিশ্বস্ত বন্ধু আছে ওদেরকে জানিয়ে রাখলাম। ওখানে যদি কোনরকম বিপদ হয় ওদেরকে ফোনে একটা খবর দিলেই ওরা সরাসরি পুলিশ নিয়ে চলে আসবে।
সোনাবাগ কলেজের ভিতরে অনেক আবাসিক ঘরবাড়ি আছে। কলেজের হোস্টেলের দিকে গার্ড থাকে আর একটা সময় পর প্রবেশ নিষেধ ওদিকে। কিন্তু এদিকে ঘরবাড়ি থাকায় সবসময় খোলা থাকে। রাতে আসা যাওয়া করা যায়। হাঁটতে হাঁটতে ভাঙা দালানটার কাছে চলে আসলাম। সকালেও এদিকে তেমন কেউ আসে না আর রাতে তো কথাই নেই। দালানের কাছে এসে ঝোপঝাড়ের ওখানে লুকিয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর আমার সন্দেহ সঠিক হলো। দালান থেকে বের হয়ে দুজন লোক,একজন মোটা আরেকজন খাটো চিকন সিগারেট টানতে টানতে কথা বলতে থাকলো।এই ছোকরা গুলোর জন্য যত সমস্যা। এখানে কেউ আসে না এদের ফির কোন শখ এখানে এসে ফির ছবিও তোলে। বলে মোটা লোকটা কুৎসিত একটা গালি দিল।
হয়। ছবিগুলো সব ডিলিট করে দিছস না? চিকন লোকটা জিজ্ঞেস করে।
হুম। তবে এর সাথে যে আরেকটা ছোকরা ছিল ও কি কোন ঝামেলা পাকাবে?
আরে নাহ। পুলিশে শুধু একটা জিডি করছে। আমরা তো ছেলেটাকে কালকে ছেড়ে দিবই। চোখমুখ বেঁধে এখানে আনছিলাম। ওয় আর এই জায়গা চিনতে পারবে না আর কিছু বলতে পারবেও না।
ভালো। চল ভাত খেয়ে আসি।চল।এই দুইজনের কথা শুনে যাক একটা ভালো খবর পেলাম যে শিহাব এখানে আছে। এরা চলে যাওয়ার পর আমি পা টিপে টিপে দরজাটার ওখানে গেলাম। ভাগ্য ভালো তালাটা খোলা।ভিতরে ঢুকে আমি প্রথম ঘরটার দিকে পা বাড়ালাম।
ফাঁক দিয়ে টর্চের মৃদু আলোয় দেখলাম ওদিকে কোনো লোক নেই। দরজা একটু চাপ দিয়ে যখনই খুলতে যাব তখনই... (চলবে)

থ্রিলারের অ-আ!

থ্রিলার সাহিত্যের একটি রহস্যময় ও উত্তেজনায় ভরপুর জগৎ, যেখানে পাঠকরা নিজেদের প্রতিনিয়ত নতুন রোমাঞ্চের মধ্যে আবিষ্কার করেন। বিশ্বজুড়ে থ্রিলারের অসামান্য জনপ্রিয়তা কোনো নতুন বিষয় নয়—থ্রিলার গল্প ও উপন্যাসগুলো পাঠকদের মনোজগতে এমন এক ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি করে যা তাদের বিভিন্ন শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায় গল্পটির শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এই সাহিত্যধারাটি কেবল বিনোদনের জন্য নয়, বরং এটি পাঠকদের মনে একটু ভিন্ন ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের জন্ম দেয়, যেখানে প্রতিটি পৃষ্ঠা উন্মোচন করে নতুন ধাঁধা, জটিলতা, এবং চিন্তার খোরাক।থ্রিলার সাহিত্যের মূল শক্তি হলো এর প্লট বা কাহিনী। একটি ভালো থ্রিলার গল্প তৈরি করতে লেখককে প্রথমেই একটি দৃঢ়, সুসংহত ও সৃষ্টিশীল প্লট তৈরি করতে হয়। এই প্লটটি হতে পারে বাস্তব জীবনের ঘটনার ওপর ভিত্তি করে, অথবা এটি হতে পারে সম্পূর্ণরূপে কল্পনানির্ভর। অনেক সময় লেখকরা মিথলজি, রূপকথা,বা ইতিহাস থেকেও প্লটের অনুপ্রেরণা নেন।
সমসাময়িকঘটনাবলী, সামাজিক সমস্যা, বা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও থ্রিলার প্লটের জন্য চমৎকার উপাদান হতে পারে। অন্যসব গল্পের মতো এখানেও প্রেম-ভালোবাসা, মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকে, তবে সেই সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে মানবিক ত্রুটি, খুন, ষড়যন্ত্র আর রহস্য। আর এটাই থ্রিলারের মূল উপজীব্য।
একটি সমৃদ্ধ থ্রিলার গল্পের মূল আকর্ষণ হলো এর রহস্যময়তা ও উত্তেজনা। পাঠককে গল্পটা এমনভাবে জানাতে হয় যেন তারা রোমাঞ্চিত হন, রহস্যের গন্ধ পান, বাধ্য হন শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়তে। এই রহস্যময়তার জাল তৈরি করতে লেখককে সতর্কতার সঙ্গে গল্পের মোড়গুলো পরিকল্পনা করতে হয়। গল্পের শুরুতে এমন একটি পরিস্থিতি বা কনফ্লিক্ট তৈরি করতে হয় যা পাঠকদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করে যা তাদেরকে গল্পের গভীরে নিয়ে যায়।

ধীরে ধীরে চরিত্রগুলোর উন্নয়ন, গল্পের জটিলতা বৃদ্ধি, এবং কাহিনীর মোড় পরিবর্তনের মাধ্যমে এই কৌতূহলকে আরও তীব্র থেকে তীব্রতর করা হয়।

তবে, একটি বিষয় মনে রাখা দরকার; প্লট হচ্ছে বীজের মতো। ভালো বীজই যেমন শেষ কথা নয়, তেমনি ভালো প্লটও ভালো গল্পের একমাত্র উপাদান হতে পারে না। আপনার সৃজনশীল লেখনী ক্ষমতাই প্লটকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবে।

থ্রিলার গল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো চরিত্র নির্মাণ। একটি প্লটকে গল্পে রূপান্তর করতে হয়, আর সেই গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায় ছোট-বড় কিছু চরিত্র। সেসব চরিত্রের মধ্যে মুখ্য চরিত্র থাকে এক বা একাধিক। শক্তিশালী মুখ্য চরিত্র না থাকলে গল্পটি এগিয়ে যেতে পারে না। তবে, মুখ্য চরিত্র সংখ্যায় বেশি না হওয়াই ভালো। মুখ্য চরিত্র অবশ্যই এমন হতে হবে যা গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করবে এবং গল্পের প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত থাকবে। এই চরিত্রটির মধ্যে থাকতে হবে একটি দুঃসাহসী মনোভাব, যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা, এবং সর্বোপরি, পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা। পাশাপাশি পার্শ্বচরিত্রগুলোও হতে হবে জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত। চরিত্রের প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্ত পাঠকদের মনে গল্পের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে, যা গল্পের গভীরতা বৃদ্ধি করে।

গল্পের আউটলাইন তৈরি করা একটি অপরিহার্য ধাপ। গল্প চূড়ান্ত করার পর আউটলাইন করা অত্যন্ত জরুরি। একটি থ্রিলার গল্পের আউটলাইন তৈরি করা মানে গল্পের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা, এবং কিভাবে গল্পটি এগিয়ে যাবে তা পূর্ব-পরিকল্পনা করা। এটি লেখকের জন্য একটি রোডম্যাপ হিসেবে কাজ করে, যা গল্পকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। এটা লেখকের সৃষ্টিশীলতাকে সঠিকভাবে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। ভালো আউটলাইন গল্প লেখার মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে।

আউটলাইন ছাড়া গল্পের পথ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শেষটায় গিয়ে ঝামেলায় পড়তে

হয়। ফলে খুব ভালো সমাপ্তি দেওয়াও সম্ভব হয় না। গল্পের সমাপ্তি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কাজটা করাও কঠিন। এটা অনেকটা প্লেন ল্যান্ড করার মতোই।

আউটলাইন করার সময় আরেকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি—শুরুতেই 'কনফ্লিক্ট' কিংবা 'অ্যাকশন' দেখানোটাই ভালো। তারপর প্রধান চরিত্রকে হুট করে সেই 'কনফ্লিক্ট-অ্যাকশনে' টেনে না এনে তার প্রাত্যহিক জীবনের কিছু খণ্ডচিত্র দেখানো যেতে পারে। চরিত্রটাকে মানবিক হিসেবে দেখানো, সেই সঙ্গে তার রূপান্তর ঘটানোর জন্য এটার প্রয়োজন রয়েছে। 'কনফ্লিক্ট-অ্যাকশন'-এর যে পরিস্থিতি, সেটার পরিবর্তনের সুযোগ রাখা দরকার গল্পে। তারপর ঘটনা যেন 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন'-এ চলে যায়, সেটা দেখানো যেতে পারে। নতুন পরিস্থিতির উদ্ভবও দেখানো যায় এরপর। তবে গল্পে অবশ্যই 'ডিভিয়েশন' থাকতে হবে। পাঠকের মনোযোগ ভিন্ন দিকে সরানোর জন্য এটার ভূমিকা অপরিহার্য। জাদুকরদের মতো থ্রিলার লেখককেও এ কাজটা করতে হয়। চরিত্রগুলোর ভেতরে টানাপোড়েন সৃষ্টি করা, ক্রাইসিসটাকে চূড়ান্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া, প্রধান চরিত্রের হতাশা, সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব দেখানো, অবশেষে ফাইনাল শো-ডাউন, আর তারপরই পরিসমাপ্তি।

কিন্তু শুধুমাত্র একটি আউটলাইন তৈরি করাই যথেষ্ট নয়। লেখককে তার সৃজনশীলতা, ভাষার ব্যবহার, এবং লিখনশৈলীর মাধ্যমে এই আউটলাইনকে জীবন্ত করে তুলতে হয়। প্রতিটি অধ্যায়, প্রতিটি দৃশ্য এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে পাঠকরা গল্পের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারেন। সংলাপ, বর্ণনা, এবং চরিত্রের মনের ভাবনাগুলোকে সুচারুভাবে প্রক্ষেপণ করতে হয়, যাতে গল্পটি সত্যিকারের প্রাণবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

উত্তেজনা ধরে রাখা একটি সফল থ্রিলার গল্পের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটি থ্রিলার গল্পের শুরুতে যদি শক্তিশালী কনফ্লিক্ট বা অ্যাকশন থাকে, তবে তা সহজেই পাঠকদের আকর্ষণ করতে পারে।এরপর, গল্পের প্রতিটি মোড় নতুন নতুন চমক সৃষ্টি করে, এবং পাঠকদের কাছে ধীরে ধীরে গল্পের সত্য প্রকাশিত হয়। এই চমকগুলো হতে পারে ছোটখাটো

ঘটনাবলীর মধ্যে, অথবা হতে পারে কোনো বড় মোড় বা টুইস্টের মাধ্যমে। পাঠকদের মনে প্রতিটি পৃষ্ঠার জন্য উত্তেজনা বজায় রাখা, এবং তাদেরকে গল্পের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা—এটিই থ্রিলার গল্পের আসল উদ্দেশ্য।
গবেষণা একটি থ্রিলার গল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ। লেখককে তার লেখা বিষয়ের ওপর গভীর জ্ঞান রাখতে হবে। ধরুন, একটি থ্রিলার গল্পে একজন ডিটেকটিভকে কেন্দ্র করে রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে; এই ক্ষেত্রে, লেখককে অবশ্যই তদন্ত প্রক্রিয়া, আইনি ব্যবস্থা, এবং ফরেনসিক সায়েন্সের ওপর ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। তবে কেবল তথ্যের স্তুপ না দিয়ে, লেখকের কাজ হলো এই গবেষণার তথ্যগুলো সূক্ষ্মভাবে গল্পের মধ্যে ঢোকানো, যাতে গল্পটি তথ্যসমৃদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।
গল্পের শেষ ধাপে আসে পরিমার্জন। আপনার লেখা যখন শেষ হবে, তখনই শুরু হবে আসল কাজ। এটা অনেকটা ভিজ্যুয়াল মিডিয়া কিংবা চলচ্চিত্রের পোস্ট-প্রোডাকশনের মতো। প্রথম ড্রাফট শেষ করার পর, লেখককে বারবার নিজের লেখা পড়ে দেখতে হয়, এবং প্রয়োজনে নতুন ড্রাফট তৈরি করতে হয়। অনেক সময় কিছু অংশ আবার লিখতে হতে পারে, কিছু দৃশ্য সম্পূর্ণ বাদ দিতে হতে পারে, বা কিছু নতুন সংযোজন করতে হতে পারে।
প্রথম ড্রাফট অনেকটা খনি থেকে খুঁজে পাওয়া হিরার মতো। ওটাকে কাটছাঁট করে পলিশ করতে হয়। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ, কিন্তু এটি লেখাকে প্রমার্জিত ও আকর্ষণীয় করে তোলে। এই ধাপে লেখককে তার লেখার গঠন, ভাষার সুষ্ট ব্যবহার, এবং গল্পের সুষমতা বজায় রাখতে হয়। এতকিছুর পরও লেখা মন-মতো না হলে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। হাল ছেড়ে না দিয়ে আরও লিখতে শুরু করে দিন। প্রচুর পড়ুন। পড়ুন আর লিখুন। মনে রাখবেন, ব্যর্থতা একটি পথ, যে পথের শেষে থাকে সফলতা।সবশেষে, মনে রাখা প্রয়োজন, একটি থ্রিলার গল্প তৈরি করা হলো এক ধরনের শিল্প, যা লেখকের সৃষ্টিশীলতা, গবেষণা, এবং লেখার দক্ষতার

ওপর নির্ভর করে। লেখক তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর সঙ্গে একটি জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলেন, এবং সেই সম্পর্কই একটি সফল থ্রিলার গল্পের জন্ম দেয়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যা শুধুমাত্র লেখকের দক্ষতার ওপর নয়, বরং তার অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনাশক্তি, এবং মানবিক অনুভূতির গভীরতার ওপর নির্ভর করে। একটি সফল থ্রিলার গল্প পাঠকদের শুধু বিনোদন দেয় না, এটি তাদের মনে একটি গভীর ছাপ ফেলে, যা তারা দীর্ঘদিন মনে রাখে।
অনুপ্রেরণায়ঃ
থ্রিলারের ব্যাকরণ | মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন | প্রথম আলো
২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নীল শার্ট
মোঃ তাহীর আবরার তাহী

কিছুটা চিন্তা হচ্ছে মুহিতের।কারণটা যদিও বুঝতে পারছে সে। তবে চিন্তা হওয়ার মতো কিছু তো নেই। কেন চিন্তা হচ্ছে?ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

কিছুটা খুশিও লাগছে অবশ্য । কারণ সবকিছুই প্রায় গুছিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আবারও মনে হয় চিন্তা করা দরকার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে । নাহলে কোনো খাদ থেকে যেতে পারে। আচ্ছা, ম্যাচের কাঠি যদি কাজ না করে ঠিক সময়ে ?পাঁচ-ছয়টা কাঠিতেও হয়তো দেখা গেলো কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তখন ? নাহ , প্র্যাকটিস করতে হবে অনেকবার। অনেক অনেকবার। যেনো কোনো ভুলই না হয় । নিখুঁতভাবে করতে হবে সবকিছু।স্কুলের বেল দিয়ে দিলো ঢং ঢং শব্দে

।কিছুটা বিরক্ত হলো মুহিত। ভাবনায় ছেদ পড়লো । তবে বিরক্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। কারণ নতুন কোনো কিছু ভাবার নেই। সবই প্রি-প্ল্যান্ড। যদিও একটা জিনিস জানা দরকার শুধু।

মুহিত ছুটে গেলো রাস্তার উল্টোদিকে। ছাঈফ আর স্বপ্ন হাঁটতে শুরু করেছিল। পিছন থেকে লাফিয়ে একটা ধাক্কা দিলো মুহিত। স্বপ্ন হাসতে হাসতে বললো, "কিরে পাগল? কী হইলো?"
-আরে না। কিছু না। এমনি আসলাম।
"বাসায় যাবি না?", বলল সাইফ।
-যাবো তো। কিছুক্ষণ থাকি। কিরে? থাকতে দিবি না?
-বাসায় কেউ নেই নাকি?
-না, আছে। যাবো যাবো।
-আচ্ছা, বল কি খবর। কিছু বলবি?
মুহিত কিছুটা ইতস্তত করে বললো, "ভালো ম্যাচের বক্স কোথায় পাওয়া যাবে বলতো? যাতে ভালোমতো আগুন ধরবে। কোনো ঝামেলা ছাড়াই। মানে ভালমতো বারুদ ভরা থাকবে।"

স্বপ্ন দুষ্টুমির স্বরে বলল, "কিরে ভাই? সিগারেট ধরলি নাকি রে? কী? বল।"

মুহিত হাসলো । মিষ্টি করেই হাসলো । যদিও সে হাসির কোনো মানে বোঝা গেল না । কিন্তু ছাঈফ চমকে উঠলো । হঠাৎ করেই ওর কেনো জানি মনে হয়েছে হাসিটা স্বাভাবিক না। কিছুটা ভয়ংকর।

ছাঈফ মুহিতের কাঁধে হাত রেখে বললো, "কী করবি তুই? সত্যি করে বলতো।" মুহিত আবার হেসে ফেললো । "আরে না। কিছুই না। এমনি। আমি তাহলে এখন আসি রে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"মুহিত চলে গেলো।দূর থেকে হাত নেড়ে বিদায়

জানালো ওদেরকে। এতো দূর থেকে মুখটা খুব ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না। তারপরও ছাঈফের মনে হলো মুহিত এখনও হাসছে। সেই রহস্যময় হাসি। ছাঈফ মাথা ঝাকালো। মনে মনে বলল, "কী ভাবছি এসব উল্টাপাল্টা! কিছুই হয়নি আসলে। সব ঠিকই আছে।"

মুহিত বিস্ময় এবং আনন্দ নিয়ে তার ডান হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। বিস্ময়ের চেয়ে আনন্দটাই চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছে বেশি করে। কি সুন্দর রং! কি সুন্দর! রক্ত দেখতে এতো সুন্দর হয়! মুহিত হাসছে। কিছুক্ষণ আগে বাথরুমে সে এন্টিকাটার নিয়ে ঢুকেছে।এরপর ডান হাতের একটা আঙ্গুল কেটেছে। কোনো কারণ ছাড়াই কেটেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা একটুও ব্যথা লাগেনি। কেন লাগেনি এটা একটা প্রশ্ন। তবে এখন এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবার সময় নেই। উপভোগ করতে হবে। মানব রক্তকে খুব সুন্দর করে উপভোগ করতে হবে। আসলেই খুব সুন্দর। অপূর্ব!

আচ্ছা, একটু চেখে দেখলে কেমন হয়? নিশ্চয়ই ভালো হয়। একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়ে যাবে।
জিভ দিয়ে আইসক্রিমের মত করে আঙ্গুল থেকে রক্তটা চেটে নিল ও। আহ! কী রোমাঞ্চ! পুরো শরীরটাই মনে হচ্ছে হেসে উঠলো। ও আঙুলে আরো কিছুটা চাপ দিলো । খুব অল্প একটু রক্ত বেরিয়ে আসলো আঙুল থেকে।

এবারও খুব আগ্রহের সাথে সেটা খেয়ে নিল ও। মনে হচ্ছে এরকম আনন্দ সে খুব কমই পেয়েছে। একবার মানুষের মাংস খেয়ে দেখলেও হয়। নিশ্চয়ই ওটার স্বাদও অন্যরকম চমৎকার হবে। মুহিত এন্টিকাটারটা হাতে নিলো। এখনও ওটাতে রক্ত লেগে আছে খানিকটা । মুহিতের মনে হলো- আগুনের পরিবর্তে ছুরি দিয়েও তো কাজটা করা যায়।শুধু ছুরিটা জায়গা মতো বসাতে হবে। খুব কঠিন হওয়ার কথা না। গুগল এ সার্চ করলেই হবে। ঠিকমতো জানা যাবে মানুষের বডি

স্ট্রাকচারটা। তবে এখন এই চিন্তা বাদ। যা প্ল্যান করা হয়েছে তাই হবে। অন্য রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না এখন।

মুহিত খাবার টেবিলে এসে বসলো। ওর মা জাহানারা বললেন, "হাতে কি হয়েছে রে বাবা?"
-কিছু হয়নি, মা। ইচ্ছে হলো তাই হাতটা কেটে ফেললাম। ভালই লাগলো।
জাহানারা হাসতে হাসতে বললেন, "বাহ! ভালো করেছিস। এখন খাবি কিভাবে? আয়, খাইয়ে দিই।"
জাহানারা পরম আনন্দে ছেলেকে খাইয়ে দিচ্ছেন। ছেলেটা এত মজা করে! ভারী দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

হোক না একটু দুষ্টু। কি আর হবে? তার ছেলের মতন মেধাবী ছেলে কি আর আছে? কেউ দেখাতে পারবে? ক্লাস নাইন পর্যন্ত একবারও ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড হয়নি ও। এরকম হিরার টুকরো ছেলে একটু দুষ্টুমি করলে ক্ষতি হয় না।

মুহিত খেতে খেতে বললো, "মানুষের মাংস খেতে কেমন হয় জানো,মা?" জাহানারা মনে মনে হাসলেন। ছেলেটা আবার মজা করছে। তিনি বললেন, "না তো। তুই খেয়েছিস নাকি? কেমন হয়? "

- না, মা। আমি খাইনি। তবে মাঝে মাঝে খুব খেতে ইচ্ছে করে। মানুষ যেমন প্রত্যেক আলাদা হয়, সেরকম প্রত্যেক মানুষকে খেতেও আলাদা হওয়ার কথা। তাই না,মা? বিষয়টা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং!
- ওহ, আচ্ছা।
- মা, তোমার সামনে যদি কেউ একটা মানুষকে পুরো রান্না করে বলে ছুরি দিয়ে কেটে যেকোনো একটা অঙ্গ খেয়ে ফেলতে, তুমি কোনটাখাবে? আমি হলে চোখ দুটো প্রথমে তুলে নিতাম। ফিস বলের মত খেয়ে ফেলতাম কচকচ করে। কী বলো? মজা না?জাহানারার অস্বস্তি লাগছে। এত বেশি ঠাট্টা ভালো নয়। সামনে খাবার নিয়ে এগুলো শুনতে গা ঘিন

ঘিন করে। জাহানারার বমি বমি পাচ্ছে। মুহিত কিভাবে এসব অবলীলায় বলতে পারছে? ওর কি রুচিতে বাঁধছে না? কী অদ্ভুত!

রাত বাজে ১২ টা ৩৩। মুহিত ওর ঘরের টেবিলে বসে আছে। হাতে একটা পেন্সিল। পেন্সিলটার মাথা ভাঙ্গা। তারপরও দেখতে ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে ভাঙ্গা শিসেই এর সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। পেন্সিলটা ছাড়া এখন ওর অন্য কিছু নিয়ে ভাবতেই ভালো লাগছে না।শুধু পেন্সিলটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

মুহিতের এই সময় ভয় হওয়া উচিত ছিল। কিছুটা হলেও। কিন্তু তার মনে কালকের চিন্তা ঘুরছেই না। সে একেবারে নির্বিকার। যা ভাবা আছে, তাই তো হবে। এত চিন্তা করে লাভ কী? তার চেয়ে বরং পেন্সিলটাকেই ভালোভাবে দেখা যাক। সে পেন্সিলটা হাতে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকলো। তারপর দুই হাতে পেন্সিলটা ভেঙে ফেললো। এখন তার আরো ভালো লাগছে। অনেক ভালো লাগছে। এই ধরনের অনুভূতি মানুষ বোঝে না কেন?ধ্বংস করার মাঝে যে কী আনন্দ তা কি সবাই বোঝে? না কেউই বোঝে না।

মুহিত পেন্সিলটা মেঝেতে ছুড়ে ফেললো। তারপরেই মনে হলো- না, এটা ঠিক হলো না। পেন্সিলটা আরো ভাঙ্গা দরকার। সে পেন্সিলটা টেবিলের নিচ থেকে তুলতে ঝুঁকে পড়লো চেয়ার থেকে। চোখ চলে গেলো টেবিলের নিচের জায়গাটায়। মুচকি হাসলো সে। টেবিলের নিচে ৫ লিটারের ক্যানে পেট্রোল ভরা আছে। এটা কিনতে তার খরচ হয়েছে ৬২৫ টাকা। টাকা জমাতেও হয়েছে অনেকদিন ধরে। এখন এটা কাজে লাগানো যাবে। এতদিন যায়নি। সবকিছু গোছাতেও সময় লেগেছে।মুহিত পেন্সিলটা হাতে তুলে নিলো। খাতায় বড় বড় করে লিখলো - আনন্দ। লিখেই বিশ্রীভাবে কেটে ফেললো শব্দটা।অবশ্য ইচ্ছাটা হয়েছিল অনেকদিন

ছোট বাচ্চাদের সাধারণ কল্পনা না। খুবই সিরিয়াসভাবে সে এটা নিয়ে ভেবেছে। ইচ্ছাটা ওর মাথায় কিভাবে এসেছিল তা মনে নেই। শুধু মনে আছে- একদিন ওর প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল কাউকে খুন করবে।

কিন্তু তখন সেটা নিয়ে কাজ করা হয়নি। সুযোগও হয়নি। এখন সুযোগ আছে। আর সবকিছুকে প্ল্যান করা হয়েছে খুব সূক্ষ্মভাবে। যেমন, কিভাবে কাজটা করা হবে তা প্রথম থেকেই ভাবাছিল মুহিতের। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে গায়ে। কাজটা করা হবে হঠাৎ করে। মানুষটা যাতে মানসিকভাবে একটা প্রচন্ড ধাক্কা খায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দ্রুত করে ফেলতে হবে পরের কাজগুলো, শকড স্টেজ থেকে বের হবার আগেই। পেট্রোল থাকবে হাতের কাছেই। ঢেলে দেওয়া হবে গায়ে। তারপর ম্যাচের কাঠিতে আগুন ধরিয়ে ছুড়ে মারা হবে মানুষটির দিকে।

মানুষটা জ্বলতে থাকবে। হাহাকার করতে থাকবে । চিৎকার করতে থাকবে। শরীরের অঙ্গগুলো জ্বলে -পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। কী সুন্দর দৃশ্য!এই দৃশ্য দেখতে যে কী আনন্দ হবে তা ভেবেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে মুহিতের।

যদিও মাঝখানে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দেও পড়েছিল সে। সমস্যাটা ছিল মানুষ নির্বাচনে। কার সাথে কাজটা করা হবে তা নিয়ে দোটানায় পড়ে গিয়েছিল ও। প্রথমে ভেবেছিল-বাবা। তারপরে অনেক চিন্তা করে বাদ দিয়েছে।

এরপর আরো অনেককেই ভাবা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাকে ঠিক করা হয়েছে, সে তার প্রাইভেট টিউটর। তার নাম জাহিদ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাথমেটিক্সের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। অনেক ছোটবেলা থেকেই পড়ায় মুহিতকে। মুহিতের পৃথিবীতে যত পছন্দের মানুষ আছে, জাহিদ তার মধ্যে একজন। এই মানুষটাকে সে প্রচন্ড পছন্দ করে। সম্মান করে বাবা মায়ের চেয়েও বেশি।কিন্তু সে জানে, খুব বেশি পছন্দের মানুষকে কাছাকাছি রাখতে নেই কখনো।মুহিত পেন্সিলটা তুলে নিলো

।খাতায় লিখলো - রক্ত। লাল টকটকে রক্ত। এটা লিখেই পেন্সিল কামড়ে ধরলো সে। দাঁত দিয়ে টেনে উপরের কিছুটা ছাল তুলে নিল। এখন পেন্সিলটাকে আরো আরো আরো ভালো লাগছে। এত সুন্দর কিভাবে হয় একটা জড়বস্তু! মানুষ নিশ্চিতভাবে এর কাছে কিছুই না।

মুহিত চোখ মেললো। ঘরে খানিকটা আলো এসে পড়েছে। সূর্য উঠবো উঠবো করছে। ক'টা বাজে এখন? মুহিত তাকালো ঘড়ির দিকে। ৪ টা ৫৭ বাজে। বাহিরে থেকে পাখির কিচির মিচির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। প্রচন্ড বিরক্ত লাগছে মুহিতের।

পাখির ডাক সে একবারেই সহ্য করতে পারে না। একটা দোয়েল এসে বসলো জানালার গ্রিলে। রক্তচক্ষু নিয়ে পাখিটির দিকে তাকালো মুহিত। পাখিটিকে মেরে ফেলে ইচ্ছে করছে এখন। কিভাবে মারা যায়? না, বেশি কিছু করা আজ ঠিক হবে না । অনেক কাজ আজকে।

মা-বাবা বের হয়ে যাবে ১০ টায়। দাওয়াতের বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে রাত। এর মধ্যেই সবকিছু শেষ করে ফেলতে হবে। স্যার আসবেন ১১ টা ৩০ এ। আচ্ছা, স্যার আজ কী জামা পড়ে আসবেন? আচ্ছা, আগুনের রং আসলে কী? লাল না কি হলুদ? নীল শিখাও তো মাঝে মাঝে দেখা যায়। তাই না? আচ্ছা, আগুনের মধ্যে কোন রংটা ফুটে উঠবে? নীল রঙ? হ্যাঁ, উজ্জ্বল নীল রং। খুব সুন্দর লাগবে দেখতে।

মুহিত মোবাইল নিয়ে স্যারকে মেসেজ করে দিলো। “স্যার, আমার একটা অনুরোধ আছে। এরপর আর কোনোদিন আপনার কাছে অনুরোধ করবো না। আপনি দয়া করে আপনার নীল শাপাখিটা এখন ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে। বসে আছে টেবিলের উপরে। মুহিত ওর ঘরের সব জানালা আর দরজা বন্ধ করে দিলো । দুটো স্ট্যান্ড ফ্যানের উপরের ঢাকনা খুলে ফেললো ও। এরপর সিলিং ফ্যান আর অন্য ফ্যান দুটো অন করে দিলো ফুল স্পিডে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো বাইরে থেকে। পাখিটা এখন ভেতরে। ১২ টার সময় মুহিত আবার এই ঘরে ঢুকবে। তখন নিশ্চয় দেখা যাবে পাখিটা মারা গেছে। দেখতে খুব ভালো লাগার কথা।
শার্টটা আজকে পড়ে আসবেন।শেষ অনুরোটা রাখবেন তো? ”

পাখিটা এখন ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে। বসে আছে টেবিলের উপরে। মুহিত ওর ঘরের সব জানালা আর দরজা বন্ধ করে দিলো । দুটো স্ট্যান্ড ফ্যানের উপরের ঢাকনা খুলে ফেললো ও। এরপর সিলিং ফ্যান আর অন্য ফ্যান দুটো অন করে দিলো ফুল স্পিডে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো বাইরে থেকে। পাখিটা এখন ভেতরে। ১২ টার সময় মুহিত আবার এই ঘরে ঢুকবে। তখন নিশ্চয় দেখা যাবে পাখিটা মারা গেছে। দেখতে খুব ভালো লাগার কথা।

এখন বাজছে ১১ টা ২০। মুহিত পড়ার ঘরে বসে আছে। সামনে বই। বইয়ে রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা। কবিতাগুলো পড়তে আরাম লাগছে।কী সাজিয়েই না লিখেছেন ফ্রস্ট! একসময় মুহিতও এরকম সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখবে। তবে তার কবিতাগুলো হবে অন্যরকম। যেই অনুভূতিগুলো মানুষ স্পর্শ করতে পারে না, সেগুলোই তুলে ধরবে সে। প্রকৃত আনন্দ পাওয়ার উপায় শেখাবে মানব জাতিকে - প্রকৃত আনন্দ।

কলিংবেল বেজে উঠলো। মুহিত বই বন্ধ করলো । শান্ত ভঙ্গিতে দরজার দিকে এগোতে থাকলো। আবার কলিংবেল বাজছে। মুহিত হাঁটার গতি বাড়ালো না। স্বাভাবিকভাবেই দরজা খুললো। স্যার দাঁড়িয়ে। স্যারকে দেখতে সুন্দর লাগছে। ফুটফুটে নীল রঙের একটা শার্ট গায়ে। পাশের রুমে পাখিটার অস্থির ওড়াউড়ির শব্দ হচ্ছে। পাখিটাও হয়তো বুঝতে পেরেছে কিছু। হঠাৎ ফ্যানের সাথে কিছু একটা ধাক্কা খাওয়ার শব্দ হলো। ওড়াউড়ির শব্দ আর নেই। মুহিত শুনেও শুনলো না। স্যারের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলো।এই হাসির ধরন ভালো না। নৃশংস এক হাসি, যার মানে স্যার ধরতে পারলেন না।

প্রেত
আবদুল্লাহ আল নোমান

আজ থেকে আমাদের স্কুলের ছুটি শুরু। তাই এবার ঘুরতে যাওয়ার জন্য আমরা রাজশাহীকে আমাদের গন্তব্য ঠিক করলাম। ছুটিতে ট্রেনে ভ্রমণের মত আর কিছুই হয় না। তাই রাতের ট্রেন এ যাওয়া ঠিক করলাম আমরা তিন বন্ধু।

২০-০৩-২০২৪
কমলাপুর আমাদের বাসা থেকে দূর হয়। তাই সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেই বিমানবন্দর স্টেশন হতে ট্রেনে উঠবো। অয়ন তাদের পাজেরো গাড়িটি নিয়ে এসেছে। তাই সকলে মিলে সেই গাড়িতেই রওনা হই আমরা। রাত দশটা পনেরোতে ট্রেন। আমরা স্টেশনে যাওয়ার পরপরই ট্রেন চলে আসে। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। টঙ্গী স্টেশন অতিক্রমের পর আমরা ঘুমিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু উত্তেজনার কারণে কারো চোখেই তখন ঘুম আসছিল না। কিন্তু ক্লান্তির কারণে কখন ঘুমিয়ে যাই টেরই পাইনা। এরপর বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব স্টেশন থেকে ছাড়ার পর আমরা কয়েকজন জেগে উঠি। রাতের যমুনা নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করি আমরা। এরপর কেবিনের বাতি নিভিয়ে পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়ি আমরা। এভাবে কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানা নেই। হঠাৎ করে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে দেখি তারা ঘুমাচ্ছে। এই সময় বাইরে তাকালে বুঝতে পারি চলনবিলের পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি। ততক্ষণে আকাশের চাঁদ ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই কেন জানি আমি অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে অস্বস্তির কারণ বুঝতে পারি। বিলের পানির উপর দিকে তাল গাছের সমান কিছু মূর্তি হেটে যাচ্ছে। আতঙ্কে মুখ থেকে আমার চিৎকার বের হয়ে আসে। আমার চিৎকারে বন্ধুদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারাও আমার সাথে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। হঠাৎ করেই আমরা বুঝতে পারি সকল মূর্তি আমাদের দিকে ঘুরে তাকিয়েছে। পেছনে কারো সাড়া পেয়ে ঘুরে তাকিয়ে আমরা হিম হয়ে যাই। আমাদের কেবিনের দরজায়ও সেইরকমই একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে

হাসছে। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই....

রাজশাহীতে স্নিগ্ধ, অয়ন ও রাফসানকে নেওয়ার জন্য অয়নের মামা দাঁড়িয়ে ছিলেন। ট্রেন এসে থামলেও তাদের কোনো দেখা নেই। এ সময় ট্রেনে তাদের কেবিনে তিনি খুঁজতে যান। কিন্তু তাদের ব্যাগ ছাড়া আর কিছুই পান না। বিষয়টি রেলওয়ে পুলিশকে জানালে তারা সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে দেখতে পান চলনবিল অতিক্রমের সময় তারা তিন বন্ধু দরজা দিয়ে পানিতে লাফ দিচ্ছে।

২০-০৩-২০২৭
আজ স্নিগ্ধ, অয়ন ও রাফসানের ছুটি। তাদের কাজই হলো মানুষের আত্মাকে দেহ হতে আলাদা করে তাদের দলে নেয়া। প্রতিরাতেই তারা বের হয় তাদের দলের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। কিন্তু আজ তাদের ছুটি কারণ আজ থেকে তিন বছর আগে তারা এ দলে যোগ দেয়। আজও তাদের মত কয়েকজনকে তাদের দলে নেয়া হয়েছে।তারা ঘুরতে যাচ্ছিল রংপুরে। অয়নদের হারিয়ে যাওয়ার পর খোঁজ অনেক চালানো হয়।তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল বিলের তলদেশে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের সকলের বুক পকেট থেকে হাতে লেখা একটি চিরকুট পাওয়া যায় ভেজা অবস্থায়। পাঠদ্ধের করে দেখা যায় লেখা ছিল...

"সেই সকল জীবদের খোঁজ করা বৃথা,
যাদের সন্ধানে মানুষ ছুটেছে অনন্ত কাল ধরে
অজানার পথে..."

কাক কাহিনী

২৪ তারিখ শনিবার ভোর ছয়টা বাজে।

ব্যাগ গোছানোই আছে। ঘুম ভেঙে চোখ খুলতেই চোখে রোদ এসে পড়ল। উঠে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করলাম। এরপর নিজে রেডি হয়ে রেকুকে খাইয়ে বের হলাম।

সকাল নয়টা বেজে গেছে।
রংপুর রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি ব্যাগ কাঁধে। আমার পাশে রেকু বসে লেজ নাড়াচ্ছে।
এক মিনিট পরেই একটা লোকাল এসে দাঁড়ালো প্রথম লাইনে। রেকুকে নিয়ে উঠে পড়লাম।
এই সময়ে অফিস যাত্রীদের ভিড়। টিটিও তেমন চেক করে না জন্য টিকিট কাটিনি ইচ্ছে করেই।
একটা ফাঁকা সিটে বসে পড়লাম ব্যাগ পাশে রেখে।
এদিকটা একটু ফাঁকা তাই রেকুকে নিয়ে সমস্যা হলো না।
জানালা দিয়ে মিষ্টি রোদ আর বাতাস আসছে। বেশ লাগছে সকালটাকে।

একটু ঝিমুনি ধরে এসেছে, এর মধ্যেই পার্বতীপুর চলে এলাম। ঘড়িতে সাড়ে দশ বাজে। স্টেশনে নেমে একটা খাবারের দোকানের দিকে এগিয়ে গেলাম।
একটা বিস্কুট কিনে রেকুকে খাওয়ালাম আরেকটা ব্যাগে রেখে দিলাম। নিজে একটা সফট ড্রিংস নিলাম।

ট্রেন লেট আজকে, তাই বেঞ্চে বসে দশ টাকার বাদাম কিনে খেতে লাগলাম। রেকু নিজে নিজে একটু হেঁটে বেড়াচ্ছে।
ওকে হুট করে দেখলে দেশি জাতের মনে হয় না। বেশ খাইয়ে আর ট্রেনিং করিয়ে তাগড়াই করে তুলেছি। গায়ের পশমগুলো বেশ বড় হয়েছে আর পেশিগুলো মাংসল। চোখের চাহনি আর ক্ষিপ্রতাও দারুণ হয়েছে।

সাড়ে এগারোটা বাজতেই ঝমঝমিয়ে স্টেশনে ঢুকলো দ্রুতযান। ৭২০ টাকা দিয়ে স্নিগ্ধার টিকিট কেটেছি যাতে রেকুকে নিয়ে একটু আরামে বসতে পারি। সিট নং ঘ ৫৩ । সিটের কাছে গিয়ে দেখলাম একজন অল্প বয়সী পুরুষ। দেখে বয়স ঠাহর করা একটু কঠিন। চোখে চশমা, গালে হালকা দাঁড়ি, ছোট করে কাটা গোঁফ, সদ্য ভার্সিটি পাশ হতে পারে বা সদ্য বিবাহিতও। তবে ৩০ এর কাছেই হবে বয়স। অনামিকার আংটি টা বেশ সুন্দর।

আমি বসতেই আমার দিকে তাকালেন। আমি হাত বাড়িয়ে বললাম,"রিঙ্কিত।"
উনি হাত মিলিয়ে বললেন,"সজল।"
তারপরই রেকুকে দেখে একটু ভয় পেলেন। ওনার মুখ দেখেই বললাম," ও ভালো ছেলে, ভয় নেই।"
বলেই রেকুর ঘাড় নেড়ে দিতে ও জিব বের করে একটা হাসি দিলো মি. সজলের দিকে। কিছুক্ষণ একটু অস্থির হয়ে থেকে জল খেয়ে শান্ত হলেন তবে কিছু বললেন না। একটু পরে বললেন, ছোট থেকেই ওনার কুকুরে ভয়। একবার নাকি পাশের বাসায় বন্ধুকে ডাকতে গিয়ে সেই বাসার কুকুর তাড়া করেছিল।...

কথা বলতে বলতেই জোর গতিতে ট্রেন চলতে লাগলো। এসির বাতাসে বাইরের গরম কমে গা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রেকুও আমার পায়ের কাছে মাথা নামিয়ে শুয়ে পড়ল।
মি. সজল একটা বই পড়ায় মন দিলেন আর ভোরে ওঠার কারণে আমারও ঘুম চলে এলো।

ফুলবাড়িতে ট্রেন দাঁড়াতেই স্টেশনের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। ঘড়িতে দেখলাম সোয়া বারোটা বাজে। রেকু ঘুমিয়ে কাদা। পাশে মি. সজলের দিকে তাকাতে দেখলাম, উনিও ঝিমচ্ছেন, বইটা বন্ধ করে কোলে হাত দিয়ে ধরে রাখা। হঠাৎই নাকে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এলো। বুঝতে পারলাম না এসি বগিতে এমন গন্ধ কোথা থেকে এলো। দেখলাম রেকুও উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিলাম।

গন্ধটা আর পাওয়া যাচ্ছে না, ট্রেন ও ছেড়ে দিয়েছে। চোখে আর ঘুম ভাব নেই। বসে থাকলাম চুপচাপ। রেকুও বসে থেকে লেজ নাড়াতে লাগলো। এরপর বিরামপুর তারপর পাঁচবিবি স্টপেজ। মাঝে হিলি পার হওয়ার সময় কাঁটা তার দেখতে দেখতে যাবো ওটাই ভাবছি মনে মনে। এমন সময় পাশ দিয়ে একজন হেঁটে গেল আর তখনই নাকে এসে বাড়ি খেলো সেই গন্ধটা। পাশে তাকিয়ে দেখি মি. সজল সেই বইটা পড়ায় মন দিয়েছেন আবার। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটা হাসি দিলেন। বললাম,"কোনো গন্ধ পেলেন?"
মি. সজল কোনো উত্তর না দিয়ে মুখে মুচকি হাসি ঝুলিয়ে রেখে চশমা ঠিক করে একটা পেন্সিল নিয়ে বই পড়ায় আবার মন দিলেন এবং পেন্সিল দিয়ে দাগাতে লাগলেন। বিরামপুর এসে ট্রেন থামতেই একটু পরে খেয়াল করলাম আমাদের বগিতে মাত্র ১০জন আছে।
রেকুকে নিয়েই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চারপাশে দেখতেছি তখন আবার সেই গন্ধটা নাকে এলো এবার আরো ঝাঁঝালো মনে হলো। ঠিক যেন এক ঝুড়ি পচা ডিম ফাটিয়েকেউ ছড়িয়ে দিয়েছে। এসব ভাবতে ভাবতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। গতি বাড়লে গন্ধটা আর পেলাম না। ভিতরে এসে এবারে নিজের সিটে না বসে পাশের জানালার সিটে বসলাম।

ট্রেনটা বেশ দুলছে। গতিও ফোনে দেখলাম ৬৫। মাথাটায় কেমন একটু ধরেছে গন্ধে। মি. সজল চুপচাপ বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আর হাতে একটা কফির কাপ ঘুরছে। আমি রেকুকে কোলে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। কয়েক মুহুর্ত পরেই বর্ডার দেখতে পেলাম। দেখতে দেখতে যাচ্ছি হঠাৎই একটু বেশি দুলে উঠলো ট্রেনটা। একটু ধরে বসেছি তখনই হঠাৎ করে বগিটা বাম দিকে কাঁত হয়ে উল্টে যাচ্ছে, আমি রেকু আর সিটটা আঁকড়ে ধরলাম। রেকু ধরা মাত্রই এক প্রচণ্ড জোরে বিস্ফোরণের শব্দ আর কাঁপুনি। সেকেন্ডের মধ্যেই প্রচণ্ড শব্দ করে ট্রেন উল্টে পড়ে কিছুটা ছেঁচড়ে গিয়ে থামলো। আমি রেকুকে ধরে রেখেছি কিন্তু মারাত্মক

ঝাকুনিতে সিট থেকে হাত সরে গিয়ে আমি আমার সেটা সিট ছিল সেটার হাতলে বাড়ি খেয়ে পড়লাম। কয়েক মুহুর্ত কেটে গেলে রেকুকে এবার নিজের সাথে আটকিয়ে নিচে অর্থাৎ ট্রেনের গায়ে নামলাম। কোনমতে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখি বাকি দশজন মানুষের পাঁচ জন নেই আর পাঁচ জন ব্যাথায় চিৎকার করতেছে। আমার ও মাথায় বাড়ি লেগেছে তবে বিশেষ সমস্যাবোধ করতেছি না। তখনই মাথায় এলো মি. সজল কোথায়!? কফির কাপ চোখে পড়ল তবে তিনি নেই।
পাশেই খেয়াল করলাম আমার ব্যাগটা। ওটা কাঁধে তুলে কায়দা করে সিটগুলো ধরে দরজা খুলে ট্রেন থেকে বের হলাম। হতেই দেখলাম পুরো আকাশ ধোঁয়াতে ভরে আছে আর চারদিকে লোকের ভিড়, চেঁচামেচি, হুইসেল আর মাইকের শব্দ। আমাকে দেখে কিছু লোক এগিয়ে এসে কি অবস্থায় আছি জিজ্ঞেস করতে লাগলো। ওদেরকে ইতিবাচক উত্তর দিয়ে সরে গেলাম সেখান থেকে।একটু দূরে এসে লক্ষ্য করলাম ইঞ্জিন, আমাদের বগি সহ প্রথম তিনটা বগি উল্টে আছে আর পরের দুটো বগি আগুনে জ্বলছে, তার পরের বগিটাও পড়ে গেছে বাকি পিছনের পাঁচটা বগি লাইনচ্যুত তবে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই অ্যাম্বুল্যান্স আর ফায়ার সার্ভিস এর গাড়ির শব্দে চারদিক ভরে উঠলো আর বিজিবি সহ অন্যান্যরা উদ্ধার কার্য ও আগুন নেভানোতে লেগে গেল।রেকুর গলার হুক খুলে দিলাম। এরপর ইঞ্জিনের সামনে দিয়ে ঘুরে অপর পাশে গিয়ে দুই নম্বর বগি যেখানে পড়ে আছে ওখানে গেলাম, এদিক উদিক খেয়াল করতেই দেখলাম রেললাইনটা স্বাভাবিক নয়। কাছে গিয়ে দেখলাম ডান দিকের লাইনটা বেঁকে গেছে আর প্রায় ইঞ্চি পাঁচেক উঁচু হয়ে আছে প্রায় মিটার খানিক মতো। মনে হচ্ছে যেন গরমে বেঁকে গেছে কিন্তু এতো বেশি তাপ কোথা থেকে এলো!মনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই অনেক দ্বন্দ্ব কাজ করছে। অনেক খেয়াল মাথায় আসতেছে, এসব ভাবতে ভাবতে ফাঁকা যায়গার দিকে যাচ্ছি ঠিক তখনই কোথা থেকে এক কাক উড়ে এসে কাঁধের পাশ দিয়ে ছোঁ মেরে চলে গেল কিছু বুঝে

ওঠার আগেই। ঘাড়ে হাত দিয়ে একটু রক্ত পেলাম। বুঝলাম ট্রেনের ভিতরেই আঘাত লেগেছিল। রেকুকে চেক করে দেখলাম ও একদম ঠিক আছে। একটু আধটু বাড়ি যা লেগেছে ওটা বাদে।
দেখলাম কাকটা সামনের বট গাছে বসে ডাকছে। আমি ওটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে থাকতেই উড়ে চলে গেল আর তখনই এক দল কাক ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল বর্ডারের ওই দিক থেকে সামনে বাজারের দিকে। ও হ্যাঁ, সমানে একটা বাজার চোখে পড়েছে হাঁটতে হাঁটতে। কি মনে হলে রেকু গিয়ে ওই গাছের নিচে বসে লেজ নাড়াতে লাগলো। কাছে গিয়ে দেখলাম গাছের গায়ে সেই সালফারের গন্ধ। আরে, হঠাৎই মাথা বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। সালফার! সালফার! এতক্ষণ মাথায় আসেনি কেনো! ওটা ছিল সালফার এর গন্ধ। তারপর মানে কেউ সালফার গ্যাস দিয়ে ট্রেনের বগি দুটোতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে...
রেকুর ডাকে আবেশ কেটে গেল। গাছের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা কাকের চিহ্ন ওটার গায়ে খোদাই করা আর কড়া গন্ধ আসছে সেখান থেকে। আর দাঁড়াতে পারলাম না, বাজারের দিকে চলে গেলাম।
২৫ তারিখ রবিবার সকাল সাতটা।

নাটোর রেল স্টেশনে বসে কড়া চায়ে চুমুক দিচ্ছি আর দৈনিক খবর পত্রিকা পড়ছি। প্রথম পাতায় দ্রুতযান এক্সপ্রেস (ট্রেন নং ৭৫৭/৭৫৮) দূর্ঘটনা আর পত্রিকার শেষ পাতায় একটা ছবি। অনেক লোকের ভিড়ে বাম কোণায় মি. সজল আর তার পাশের একটা ক্যানভাসে সেই চিহ্নটা...
গতরাতে বাস ধরে নাটোর এসেছি। আর স্টেশনে বসে আছি এরপর থেকে। ব্যাগটাও খুলিনি পর্যন্ত। হোটেলে একবার খেয়েছি শুধু আর ফোন বের করে সেই ভোর থেকে ভেবে চলেছি আর নোট করে যাচ্ছি কি হচ্ছে ট্রেনে

ওঠার পর থেকে।...তখনই রেকু ব্যাগে মুখ দিয়ে একটা বই বের করে আনলো। বইটা দেখে চমকে গেলাম। মি. সজলের সেই বইটা আর ভিতরে পেন্সিলটাও আছে। খুলে পেন্সিল সড়াতেই দেখলাম সেই কাকের চিহ্ন আর একটা পাঁচ অঙ্কের কোড।

অন্য আমি
আশরাফুল ইসলাম (ছাপ্পান্ন)

আমি আবিদ। পুরো নাম আবিদ হাসান। আমি একটি মফসল এলাকায় বাস করি। এখানে থাকলেও আমার গ্রামের বাড়ির পরিবেশ খুবই ভালো লাগে। তাই মাঝে মধ্যে সুযোগ পেলেই ছুটে চলে যাই।
বাড়ির যাওয়ার পথে বিশাল বড় মাঠ পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। সাধারণত এখানে খেলাধুলা আর বিকেলে অনেকে বসে সময় কাটানো ছাড়া এখানে কেউ আসে নাহ।সন্ধার পর থেকে অনেকটা নিশ্চুপ নির্জন ই বলা চলে।

একদিন সে মাঠেই ঘটে অভাবনীয় ঘটনা যা আমার জীবনকে এক নিমিষেই থমকে দাড়ায়।

সেদিন দিনের কাজগুলো শেষ করে ঐদিন বাড়ি যেতে একটু সন্ধা হয়ে যায়।
বাইসাইকেলটা একটু সমস্যা হওয়ার কারনে হাটাকেই উপযুক্ত মনে করি। যদিও বাড়ি যেতে সময় লাগবে আর পায়ের অবস্থাও দফারফা হতে বাকি থাকবেনা।

তবুও সেদিন হেটে যেতে কেমন স্বস্তি লাগছিলো।

প্রতিদিনকার মত মাঠের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই মাঠের এক কোনে চোখ যায়।
একটা লোক বসে আছে বুঝা যাচ্ছে।
একটু দূরে হওয়াতে ঠিক বুঝা যাচ্ছে নাহ লোকটি যুবক নাকি বয়স্ক।কোন নাড়াচাড়া বা সারা শব্দ ও নেই।
অতঃপর কৌতুহল মিটাতে কাছে গেলাম।
পরনে সাদাসিধে পোশাক, টি-শার্ট আর প্যান্ট।
হাত পাঁচেক দূর থেকেই ডাক দিলাম এই যে শুনছেন...?

(স্বাভাবিক দিক হিসেবে গলার আওয়াজ টা অনেক বেশি, তারপরও কোন সাড়া নেই।)
তারপর আরো কাছে গিয়ে সামনাসামনি হলাম।
যখনি মুখের দিকে তাকালাম,
তাকানোর পর আমি হত বিমুখ....
এ যে অবিকল আমার মতই দেখতে।
মুখের গঠন,স্বাস্থ্য, ঠোঁট, নাক চোখ সবই এক।তফাৎটা শুধু আমরা দুজন।
বেশ কিছুক্ষন তাকিয়ে পর্যবেক্ষণ করে নিলাম।নাহ আমার সাথে কোন দিকে অমিল খুজে পাচ্ছি নাহ।
মনে মনে ভাবছি," কে ইনি। ইনাকে তো চিনি না।
এর আগে এলাকায় কখনো দেখিও নি।
আর এ সময় এখানেই বা কি করছে।"
সব প্রশ্ন গুলো মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে।
~~ ৫৬...

থ্রিলিং FACTS

রাতে ঘুমাতে গেলেন আর সকালে উঠে দেখলেন আপনার দেশ আর নাই। এটা যতোটা না কাল্পনিক মনে হয় তার চেয়ে বেশি বাস্তব। বাস্তবে এটি ঘটে রাশিয়ান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও মহাকাশচারী শেরগেই কন্সতান্তিনভিছ ক্রিকালেভ এর সাথে। ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে তখন ক্রিকালেভ মীর নামক স্পেস স্টেশনের মাধ্যমে মহাকাশ ভ্রমণ করছিলেন।

তার পূর্ব নির্ধারিত ল্যান্ডিং জোন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সদ্য স্বাধীন হওয়া কাজাকিস্তান। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণে তিনি পরেন ফ্যাসাদে। যে দেশ তাকে মহাকাশে পাঠাল সেটাই তো আর নেই। তখন শুরু হয় অনিশ্চয়তার।মহাকাশে যত সময় থাকার কথা তার চেয়ে থাকতে হয় দ্বিগুণ সময়। অবশেষে দীর্ঘ আলোচনার পর ২৫ শে মার্চ পৃথিবীতে ফেরেন তিনি। এমন অভিজ্ঞতার পরেও অনেকবার মহাকাশ অভিযানে যান ক্রিকালেভ। মজার ব্যাপার মহাকাশে দীর্ঘদিন থাকার কারণে পৃথিবীর লোকদের তুলনায় বয়সে ০.০২ সেকেন্ড ছোট হন তিনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সময় মহাকাশে থাকায় অনেক সময় তাকে অভিহিত করা হয় শেষ সোভিয়েত নাগরিক হিসেবে।